প্রতিক্রিয়া

শঙ্খ ঘোষ

কয়েকটি কবিতার ব্যবহার আছে নীচের এই লেখাটিতে। সেটা এজন্য নয় যে ওই কবিতাগুলির সবটাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণীয়তম রচনাবলির অন্তর্গত। কবিতাগুলির সঙ্গে কিছু পাঠস্মৃতি জড়ানো থাকা, আর সেই স্মৃতিসূত্রেকয়েকটি কথা উঠে আসা--এইসব নিয়ে পরিকল্পিত এ- লেখাটিকে গুতর কোনো প্রবন্ধ হিসেবে পড়লে ভুল হবে।

।। এক ।।

এসব আজকাল কী লিখছেন সুভাষদা

আমরা তখন এম এ ক্লাসের ছাত্র। কোনো কবিতা বা কবিতার বই ভালো লাগলে কয়েকজন বন্ধু একসঙ্গে মিলে সে-বই বা সে-পত্রিকা পড়ি, হৈ হৈ করি তা নিয়ে। তেমন - তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে খারাপ লাগলে তা নিয়েও নৈরাশ্যের উত্তেজনা প্রকাশ করি সবাই মিলে, একসঙ্গে। যদি কোনো প্রিয় লেখকের লেখা হঠাৎ কখনো মনের মতো না হয়, তা হলে তো সমবেত বিলাপধবনি একেবারে তুঙ্গে গিয়ে পৌঁছোয়।

সেইরকমই দিনের একটা সকালবেলায়, বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে দেখি সকলের বেশ মনখারাপ। কী হল হঠাৎ? কোনো খারাপ খবর? হ্যাঁ, তাই। সেদিনকার স্বাধীনতা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা. এসব আজকাল কী লিখছেন সুভাষদা? এ কি কবিতা? একে কি কবিতা বলে ? এই বলে পত্রিকাটা এগিয়েদেয় এক বন্ধু। খুলে দেখি সুভাষদার নামে একটি মিছিলের কবিতা ছাপা হয়ে আছে সেখানে। সে - কবিতার না আছে ছন্দ, না আছে কোনো শব্দজৌলুস, না আছে কবিতা বলবার মতো বিন্দুমাত্র কোনো উপাদান।

পত্রিকায় কি নামে ছাপা হয়েছিল সেটা? তা এখন আর মনে নেই ভালো, তবে অনেকগুলি না শব্দের অভিঘাতে ওই শব্দটাই বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে স্মৃতিতে, তখন থেকে আজও পর্যন্ত। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-য় ফুটুক পর্যায়ের মধ্যে যখন প্রথম গ্রন্থবদ্ধ হল যেতেই হবে নামের সেই লেখা, তখন, ফুল ফুটুক -এর অন্যকবিতাগুলির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে তার যে ভিন্ন একটা চরিত্র দাঁড়াল, বুঝতে পারলাম সেটা। কিন্তু, সত্যি বলতে কী, সেদিনকার সেই সকালবেলায় স্বাধীনতা পত্রিকা হাতে নিয়ে বন্ধদের বিলাপে সায় দিতে হল আমাকেও। সত্যিইসকালবেলায় স্বাধীনতা পত্রিকা হাতে নিয়ে বন্ধুদের বিলাপে সায় দিতে হল আমাকেও। সত্যিই তো, এসব আজকাল কী লিখছেন সুভাষদা? এ কি কবিতা?

কোনো একটা প্রতিবাদের মিছিলদিন ছিল সেটা, এ বোঝাই যায় যে তারই উদ্দীপনা জোগাতে পত্রিকায় ছাপা হচ্ছিল ওই লেখা। আমরা ধরে নিলাম সাংবাদিকতার দায় মেটাচ্ছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মেটাচ্ছেন তাঁর দলীয় আনুগত্যের রাজনৈতিক দায়। কিন্তু সেটা মেটাবার জন্য আগেও তিনি লিখেছেন অনেক, সেসব তো আমাদের চেতনার মধ্যে সজীব রয়ে গেছে তখনও। আমাদের পায়ের চলায় চলায় ছন্দ তুলে মিছিলেরই তো কবিতা আমাদের উচচারণে উঠে আসছে তখন

খবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া খ্যাপা জোয়ার ---

হাতের মুঠোয় বজ্র, আমরা মিছিলে হাঁটি।

জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার?

অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাঁটি। (স্ফুলিঙ্গ)
আর আজ? সেই মিছিলকবিতার পরিণতি হল এই? ওঠে আগুনের হল্‌কা ক্ষিপ্র ছুটে চলায় --- কোথায় গেল কবিতার সেই আগুন, সেই স্ফুলিঙ্গ? নতুন কবিতাটি দেখা দিল এইরকম

কে যায় ?
আমরা।
আমরা গাঁয়ের
আমরা শহরের
হাড়কালি মানুষ।
চলেছি মিছিলে।

হাতে কী?
নিশান

কোথায় যাও?
দমন রাজার
দরবারে।
থামো---
---না।
বাধা দিলেও
--- না।
সঙিনে বিঁধলেও
--- না।
সঙিনে বিঁধলেও
--- না।

রাস্তা দাও।
আমাদের যেতেই হবে
মিছিল।।

কিছুদিন পর অবশ্য আমাদের প্রাথমিক সেই নৈরাশ্য কিংবা ধিক্কারবোধ আস্তে আস্তে পালটে গেল একরকম গ্রহিষ্ণুতায়। মনে হল, আমরা কেন পুরোনোকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি নতুনের মধ্যে? আমাদের পাঠকস্বভাবের এই এক মুশকিল। যে-কবি আমাদের মনে যে-ভাবে চিহ্নিত হয়ে যান একবার, আমরা তাঁকে চিরদিনের মতো আটকে দিতে চাই চেনা সেই চিহ্নের মধ্যে। কিন্তু পাঠকের প্রত্যাশাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তো লিখতে পারেন না কোনো কবি, কবির লেখাকে ছুঁয়ে ছুঁয়েই এগোতে হয় পাঠককে। এই সামান্য বোধটাই আমাদের মধ্যে তখন কাজ করেনি যে পুরোনো মিছিলের সঙ্গে নতুন এই মিছিলের একটা দূরত্বই হয়তো চাইছেন এই কবি, চাইছেন নিজের পুরোনো কবিতার ছাঁচথকে সরে এসে কবিতার নতুন কোনো ভাষা খুঁজে নিতে। স্ফুলিঙ্গ কবিতাটিতেও ছিল আমরা, যেমন আছে এ-কবিতাতেও। কিন্তু চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার কিংবা ছুটে আসে যারা বঞ্চিত - ধরনের কথাগুলির প্রথম পুষ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে এখানে বাইরে - থেকে - দেখাটাও গেছে মিশে, যেতেই হবে, কবিতাটির মতো সম্পূর্ণভাবে সেই মিছিলকারীদের নিজস্ব কথা হয়ে ওঠেনি তা। নতুন এই কবিতার শব্দগত উগ্রতা কম, অলংকরণের বালাই নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও (অথবা হয়তো সেইজন্যেই) এর চলনের দৃঢ়তা বেশি। চোয়ালশক্তকরা প্রত্যয়বদ্ধ মুখের কথার উপর এর ভর। প্রথম পড়তে গিয়ে আমরা বুঝতে পারিনি যে সরাসরি এই

পথচলতি মুখের কথায় নেমে আসাতেই ছিল কবির লক্ষ্য, কবিতার ভাষাটাকে পালটে দেওয়াই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ভাষা মানে এখানে শুধু শব্দ নয়, কথা। কবিতার মধ্যে কীরকম কথা থাকবে, থাকতে পারে, তার বিবেচনাতেই যে একটা বদল আসছিল এই কবির, আমাদের বুঝবার বিষয় ছিল সেইটে। সেটা বুঝতে না পেরে অমলেন্দু বসুর মতো কবিতাবোধসম্পন্ন মানুষ এবং সুভাষের মস্ত এক অনুরাগীকেও এক কথা একবার লিখতে হয়েছিল যে, আশঙ্কা হয় সুভাষের কাব্যবিচারও কিঞ্চিৎ শিথিল হয়েছে। তা নইলে -- প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি --- নাজিম হিকমতের এতগুলি অযোগ্য পদ্যের অনুবাদ তিনি কেন করতে গেলেন? সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজের কথায় এর যে উত্তর ছিলনা তা নয়। তিনি তখন ভাবছিলেন আমরা এতদিন যে আবেগে লিখে এসেছি... সব বড় বেশি টান, বড় বেশি ধরা -বাঁধা। এই ধরা - বাঁধা কবিতাজগৎটা ছেড়ে আসবার একটা ইশারা তিনি পাচ্ছিলেন নাজিম হিকমতেরই কবিতার মধ্যে, আর তাই এত আগ্রহ নিয়ে সেইসব অযোগ্য পদ্যের তিনি অনুবাদ করেছিলেন, একবার নয়, একাধিকবার। কিসের খোঁজে তা তিনি করেছেন সেকথা মনে রেখে পড়তে পারলে, আমাদের নিজস্ব অভ্যাসের গণ্ডি থেকে বেরিয়েএসে পড়তে পারলে, হয়তো তখন বুঝতে পারতাম আজকাল এসব কী লিখছেন সুভাষদা, কেন লিখছেন। নাজিম হিকমত বিষয়ে তিনি জেনেছিলেন যে প্রথাগত ছন্দ ভেঙে তাকে তিনি দাঁড় করান মুখের কথার কাছাকাছি। কবিতায়বাঁধাগৎ ছিল তাঁর প্রকৃতিবিদ্ধ। বাংলা কবিতায় সুভাষও - যে কোনো একটি অ - কবিতা-র ভাষাসন্ধানে বাঁধাগতের বাইরে এগিয়ে চলেছেন, স্বাধীনতা-র কবিতাটি পড়ে সেই মুহূর্তে আমরা অনেকেই তা বুঝতে পারিনি। কবির নয়, সেটা ছিল আমাদের ব্যর্থতা।

।। দুই ।।

এসব আজকাল কী লিখছেন সুভাষ

মনে পড়ে অল্প কয়েক বছর পরের এক দৃশ্য। পরিচয় পত্রিকার অফিসঘরে এসেছেন সোমনাথ লাহিড়ী। সদ্যপ্রকাশিত একটি সংখ্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি কবিতা পড়ে বিরক্ত মুখে পত্রিকাটি ছুঁড়ে দিচ্ছেন এক কোণে, কবিতাটি তাঁর পছন্দ হয়নি। এই কি সুভাষ ? বলছেন তিনি। সেটা যে ঠিক কোন কবিতা ছিল তা আমার মনে নেই, এইটুকু কেবল মনে আছে যে সে-ও ওই ফুল ফুটক পর্যায়েরই লেখা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, বারে বারেই বলেছেন যে তাঁকে হাতে ধরে বাংলা লিখতে শিখিয়েছিলেন লাহিড়ী, একটা লেখা দশবার লিখিয়ে তবে ছেড়েছেন, আর এ-ও লিখেছেন যে আমি সেই মুষ্টিমেয়ের একজন, বেশির ভাগ সময়ে মতে না মিললেও যার প্রতি লাহিড়ীর ভালবাসায় কখনো টান পড়েনি। বাইরে থেকে সেকথা আমরাও টের পেতাম না তা নয়, কিন্তু ওই একদিন দেখেছিলাম তাঁর শিষ্যের প্রতি ভালোবাসা টলে - যাওয়া, এক মুহূর্তের জন্য হলেও। কিন্তু টলে যাবার সেই মুহূর্তে লাহিড়ী যা লক্ষ করেননি তা হল তাঁরই দেওয়া প্রেরণায় দেশদেখা আর গদ্যলেখার যে-মন তৈরি হয়েছিল এই কবির, কবিতার মধ্যে আসতে চাইছিল তার প্রবাহ। লক্ষ যে করেননি, তার কারণ প্রগতিশীল কবিতার অতিস্থির একটা কাঠামো এঁদের অনেকের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল তখন। কিন্তু সুভাষ সেই সময়ে (১৯৫৩) স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন যে শুধু সংগ্রামের ডাক আর চড়া গলার দাবি নিয়ে প্রগতিশীল কবিতা হয় না. সব সময়ে আমরা মুখ গোমড়া করে আছি, সবই কেমন একরঙা ! অথচ জীবনটা তো এইরকম

পাড়ার লোকে পুকুরে স্নান করছিল। হঠাৎ কানে এল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, বোনাসের টাকায় কে কী করবে। কেউ দেবে বউকে পোর নাকছাবি, কেউ দেবে ছেলেমেয়েদের ঝকঝকে পোশাক, কেউ তারভাঙা চাল নতুন করে ছেয়ে নেবে। বোনাস বলতে শুকনো টাকার গাছ নয়। মনে মনে অঙ্কুরিত হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট কল্পতরু চারা।

সুভাষ যে এই চারাগুলিকে লালন করতে থাকবেন এখন থেকে, জান-লড়িয়ে দেওয়া শাহিদ- শহিদ ভাব থেকে সরে আসতেই যে চাইছেন তিনি, লাহিড়ীদের মতো কবিতাপাঠকদের কাছে তার আর প্রশ্রয় রইলনা বেশি।

সেটা জানবার পরও অবাক হয়েছিলাম মধ্যষাটে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটা প্রতিক্রিয়া দেখে। কবিবর অভিন্নহৃদয় এই বন্ধু, বন্ধুর যেকোনো সামান্যতম কৃতিতেও যিনি গর্বিত আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, তাঁর শম্ভুনাথ পণ্ডিত রোডের বাড়িতে বসে এক দুপুরবেলায় পরম দুঃখে তিনি বলে উঠেছিলেন এসব আজকাল কী লিখছে সুভাষ ! প্রায় বারো বছর আগেকার আমাদেরই কথার প্রতিধ্বনি শুনে চমকে উঠেছিলাম সেদিন। চমকের সঙ্গে ছিল একটা অপ্রস্তুত দশাও। কেননা,

পত্রিকায় সদ্যপ্রকাশিত যে - কবিতাটিকে টেবিলের উপর রেখে দেবীপ্রসাদ ওই অবহেলার কথাটি বলেছিলেন, আমার সেটা দিব্যি ভালো লেগেছিল। কিছুই নেই সে-কবিতায়, নির্ভার যেন, আর সেইজন্যেই মনে হয়েছিল ভালো

মুখখানি যেন ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি
দু-অধরে চেপে চাঁদ একফালি
নেমে গেল এক্ষুনি

তাঁর দুটি আঁখি অঞ্জন পাখি
দূরে কাছে ঘুরে নাচে।
এই আছে এই নেই আছে নেই
দূরে কাছে ঘুরে নাচে

নেমে গেল এক্ষুনি

হাওয়া বারে বারে আঁচল সরায়
হাত বারে বারে ঢাকে
হাত খালি হলে আঙুল জড়ায়
সময়কে পাকে পাকে

নেমে গেল এক্ষুনি

ঝুঁকে পড়ে চোখে চূর্ণ অলক
যেন চায় পড়ে নিতে
শ্বেতপাথরের স্মৃতির ফলক
মণি জ্বালা চারিভিতে

নেমে গেল এক্ষুনি

পদচারণায় দূরে নিয়ে যায়
তার কায়া তার ছায়া
দু-চরণে বোনা যাব কি যাব না
ও-বনে ও - যৌবনে

নেমে গেল এক্ষুনি

থাকতে দেখি নি চেয়ে অকপটে
তার সে মুখচ্ছবি
দেখি আকাশের প্রচ্ছদপটে
ছাপা সে মুখচ্ছবি

নেমে গেল এক্ষুনি
ট্রেন খালি করে ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি।।

কিছুই নেই, স্নিগ্ধ আর প্রাত্যহিক আর আকস্মিক একটা ছবি ছাড়া। ট্রেন থেকে সুন্দরী একটি মেয়ে নেমেগেল, এই মাত্র। তাকে দেখে ভালো লাগছিল, যদিও খোলাখুলি দেখতে সংকোচও ছিল। সে-ও ছিল আনমনা। নেমে যাবার পর, স্মৃতিতে সে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশপটে। এই তো মাত্র কথা।
কিন্তু এ নিয়ে কি কবিতা লেখা যায়? লেখা কি উচিত ? যে-পাঠক জানেন যে এর রচয়িতা একজন সংগ্রামের কবি, প্রগতির কবি, কমিউনিস্ট কবি, তাঁর মনে ধন্দ জাগে। প্রশ্ন করেন তিনি এসব কথা বলা কি তাঁর সাজে?মিষ্টি মিষ্টি প্রেমের কবিতার একটা আদল এসে যায় না তাতে ? আর আমরা কি শুনিনি যে প্রেমের কবিতায় নষ্ট হয়ে যায় বৈপ্লবিক আবহ? শুনিনি কি প্রেম বিপ্লবের শত্রু ?
ঠিক এই ভয় থেকেই ১৯৫৩ সালের একটি সভায় সুভাষ বলেছিলেন
মিষ্টি করে লিখলে নাকি প্রগতিশীল কবিতা হয় না। বাজে কথা। আমার চেনা শ্রমিক আন্দোলনের নেতা আছে। সে নিজেও শ্রমিক। বাইরেটা কাঠকোট্টা। তার এক ছেলে।... সে আবার ছেলে - অন্ত প্রাণ। ... ছেলেকে চোখের দেখা না দেখলে কোনো কাজেই তার মন লাগে না। তার এই সুকুমার বৃত্তিটাকে গলা টিপে মারতে পারলেই কিসে সাচ্চা বিপ্লবীর তকমা পাবে? কবিরা তো রসস্রষ্ট্র। না কি প্রগতিশীলেরা কবি নয়? তাহলে মধুররসে তাদের ভয় কিসের?
কবির মন সবদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারে বলেই, নিকোলাস গ্যয়েনের মতো কিউবার বিপ্লবী কবিও তাঁর নিতান্ত পরিচিত ধাঁচ থেকে সরে এসে কখনো - বা বলতে পারেন
কবি একদিন বুঁদ থাকতেন
ঝংকারে ঝংকারে।
আর আজ কবি নিজের ভিতরে ফিরে
সেইখানে তংার গভীরে নিজেরই অর্কেষ্ট্রাকে বাজান।
কিন্তু তা বাজালে, ভিন্ন কোনো মনোজগতের চকিত স্ফুরণ ঘটলে, সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বলে বসতে পারি ইনি হয়তো সরে যাচ্ছেন ভিন্ন কোনো শিবিরে, সংগ্রাম থেকে প্রেমে, সংঘ থেকে ব্যক্তিতে। যেন এর মধ্যে সত্যি সত্যি দুস্তর বৈপরীতা! কেনই - বা একজন সংঘগত সংগ্রামী বলবেন না তাঁর ব্যক্তিগত ভালোবাসার কথা, তাঁর ব্যক্তিগতস্মৃতি, তাঁর জীবনপথের রোমাঞ্চ ? লড়াইয়ের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই এর, বরং লড়াইয়ের একটা অলঙঘ্য শক্তিইসে জাগায়। কেউ দেয় নি কো উলু থেকে শু করে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ কবিতার বইয়ের শেষ কবিতা তুমিতো কাঁদো না পর্যন্ত রচনার সেই ব্যক্তিগত সৌন্দর্য সব মানুষকেই বুঝতে দেয় যে আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই / যে / সারাক্ষণ হাসতেই থাকব, নানা বৈচিত্র্যে মেলানো আমি গোটা একটা মানুষ। সেই গোটা মানুষের কথাই তো বলতে ইচ্ছে করে কবির? এমনকী, বিপ্লবী কবিরও ?

।। তিন ।।
আঃ, কী লিখেছে এবার সুভাষ !
১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাস। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের টালা পার্কের বাড়ির সামনে অনেক মানুষের ভিড়। তাঁর প্রয়াণ হয়েছে অল্প আগে।
সামনের খোলা মাঠে বসে আছি কয়েকজন। সেখানে এসে জুটলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। শেষযাত্রা কোন পথে কীভাবে যাবে, তার ছক তৈরি করে দিয়ে এবার তিনি সাময়িক বিরতিতে এসে বসলেন। বসেই, একটা দুটো কথার পর বলে উঠলেন
আঃ কী লিখেছে এবার সুভাষ !

উদ্‌গ্রীব হন সকলে। কোথায়? কোথায় লিখেছেন ?
এবারকার দেশ-এর শারদীয় সংখ্যায়।
সামনেই পুজো। মহালয়ার তখনও কয়েকদিন বাকি। কিছুদিনের মধ্যেই একটাদুটো করে বেরোতে থাকবে শারদীয়াগুলি। কিন্তু এখনও যার প্রকাশ হয়নি তেমন একটা কবিতার কথা বলতে গিয়ে ভাষার উচ্ছ্বাসে ভরে উঠলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। বললেন পত্রিকা বেরোলে দেখো। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে কবিতাটা ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখা উচিত। সুভাষের এ-লেখার কোনো তুলনা নেই।
একজন বললেন গত বছরেও তো চমৎকার একটা লেখা ছিল ছেলে গেছে বনে।
হ্যাঁ, সেটাও ভালো। কিন্তু এটা তারও চেয়ে ভালো। গোটা সময়টা এর মধ্যে আছে। দেখে নিয়ো সবাই। কবি হতে হয় তো এমন। কীভাবে লিখতে হয়, সুভাষের কাছে তা শেখা উচিত সকলের।
ভালো লাগলে সন্তোষকুমার একটু বেশিই উদ্দাম হন, সেইটে বুঝে তাঁর সমবয়সি কেউ কেউ কথাটা অন্যদিকে ঘোরাবার চেষ্টায় রইলেন। কিন্তু তবু বিরত করা গেল না তাঁকে। কয়েকদিন পরে সকলেই যে - কবিতাটি পড়তে পাবেন, ফেরাই নামের সেই দীর্ঘ কবিতাটির বিষয়ে কথা বলতেই লাগলেন সন্তোষকুমার ঘোষ।
তখনও জানতাম না যে সন্তোষকুমার ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অল্প বয়সের বন্ধু, তাঁদের কল্যাণ সঙ্ঘের একজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। বরং তখন জানতাম এঁরা দুই বিপরীত শিবিরের মানুষ, সাহিত্যচর্চা আর রাজনীতিবোধে দুরধিগম্য এঁদের দূরত্ব। বাংলাদেশ নিয়ে তখন পরম উত্তেজনা চলছে, আর সে -উত্তেজনায় এঁরা কিছুটা কাছাকাছি এসেছেন তা দেখতে পাই--- কিন্তু তাহলেও চমক জাগায় ওই অকারণ উদ্‌বেলতা, ওই নিরহংকার সমর্পণ। শুধু চমকই নয় একটা ভাবনাও জেগে ওঠে সেই সূত্রে।
কাল মধুমাস-এর পর্ব থেকেই মনে হচ্ছিল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুরোনো পাঠকেরা যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছেন দূরে। আর সরাসরি যাঁরা রাজনীতিজগতের বামপন্থী মানুষ, এসব কবিতার প্রতি শিথিল হয়ে আসছে তাঁদেরও টান। শুধু যে শিথিল হয়ে আসছে তা নয়, সদ্যবিভাজিত পার্টির এক অংশ অন্য অংশের দিকে যখন ছুঁড়ে দিচ্ছে অবিশ্বাস, বিদ্রুপ, এমনকী ঘৃণা--- তখন তার তাপ এসে পৌঁছোচ্ছে কবিতারও দিকে। আর সম্ভাবতই সেটাসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার দিকে, কেননা অন্যান্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে তাঁর সাহিত্য অকাদেমির পুরস্কার পাওয়া। লোক-খ্যাপানো ব্যঙ্গে সুভাষের কবিতাকে (বা মানুষটিকেই) হেনস্থা করছেন উৎপল দত্ত, কবিতারই মধ্য দিয়ে, জনসভায় দাঁড়িয়ে। সুরজিৎ বসু নামের এক তণ লেখক চিঠিতে জানাচ্ছেন (৬/১০/৬৭) গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেশব্রতীতে উৎপল দত্তর মহাকবিতা দেখেছেন? ভয়াবহ ব্যাপার এবং সুভাষদার খুব সাবধানে পথ হাঁটা দরকার। আর সুভাষদাকে (২/১০/৬৭) দত্তমশাই এখনও যে আপনাকে কত শ্রদ্ধা করেন তা তাঁর অ-কবিতাতেও স্পষ্ট। নইলে এত লোক থাকতে আপনাকেই বা এক হাত নেবেন কেন। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে অগত্যা লিখতে হচ্ছে

ডান কানটা বিগড়ে গেলেও
বাঁ কানটা আছে
তাইতে ধরছি কে এবং কী
ছাড়ছে ধারে - কাছে ---

আপনি, মশাই, গেছেন বদ্‌লে
বদ্‌লে গেছেন, ছি ছি!
আগে গলায় বাজ ডাকতেন
এখন করেন চিঁচিঁ।

ইনাম পেয়ে জাহান্নমে
গেছেন, বলব কী আর---

প্রগতির লোক ছিলেন আগে
এখন প্রতিক্রিয়ার।

ফুলকি ছেড়ে ফুল ধরেছেন
মিছিল ছেড়ে মেলা
দিন থাকতে মানে মানে
কাটুন এই বেলা।

হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং---
চলে যাচ্ছি ড্যাড্যাং ড্যাং।।

ফেরাই কবিতাটি নিয়ে সন্তোষকুমার ঘোষের উচ্ছ্বাস শুনতে শুনতে মনে হল কবিতাপাঠকের কি শিবিরবদল ঘটছে এইভাবে? ওপরের ওই ল্যাং কবিতাতে চলে যাবার যে-কথা লিখছেন সুভাষ, তা-ও কি সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে তবে, সেই যাওয়া? পুরোনো পাঠকেরা সরে যাচ্ছেন, আসছেন নতুন পাঠকেরা? অন্তত, সেই পুরোনো পাঠকদের প্রবল কোনো আগ্রহ দেখিনি ফেরাই প্রকাশের পর, ঘরে ঘরে তাকে টাঙানোর কথা নিশ্চিতভাবেই মনে হয়নি কারো। মনে হয়নি, কারণ এ - কবিতায় যে - কষ্টের বোধে কথা ছিল, যে - কণা, অধিকাংশ বামপন্থী মন তাকে গ্রাহ্যকরতে চায়নি। লালগাড়ি - পাশ হওয়া / ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ /অপাপবিদ্ধদের দল-কে বিষম পাপবিদ্ধ বলেই মনে করেছে বড়ো একটা অংশ, আর অন্য অংশটা মানতে চায়নি যে এ - রাজধানীতে একদল বাইরে থেকে ওসকাচ্ছে / একদল ভেতর থেকে ভাঙছে, মানতে চায়নি যে গড়বার দল নয় / একটা ভাঙবার চত্র / নামাবলী গায়ে দিয়ে ভক্তদের ভোলাচ্ছে। যারা শত্রুকে একঘরে না করে বন্ধুকে শত্রু করছে, যারা সংগ্রামের সঙ্গীদের আত্মহত্যার দিকে ঠেলেদিয়ে মৃত্যুর গুণগান গাইছে, তাদের কারো সঙ্গেই ভাবনায় মিলল না বলে একটু একটু করে একা হতে লাগলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বেদনাবোধ আর সত্যদর্শন থেকে স্বনির্বাচিত সে একাকিত্বের উপলব্ধিটাই হয়তো সেদিন এতটা মুগ্ধ করেছিল সন্তোষকুমারকে।

।। চার ।।

এসব কী লিখছে সুভাষ মুখুজ্যে!

এক বছরের জন্য তখন শান্তিনিকেতনে আছি, ১৯৭৮ সাল। আমার যেখানে বসবাস তার ঠিক সামনেই থাকেন প্রবোধচন্দ্র সেন, সেই প্রবোধচন্দ্র যিনি পদাতিক বইয়ের ছন্দব্যবহার দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন আর প্রকাশেরঅল্প পরেই পরিচয় পত্রিকায় দীর্ঘ ব্যাখ্যান করেছিলেন সে-ছন্দের বিশিষ্টতার। একদিন সকালবেলা ডেকে বলবেন সেই প্রবোধচন্দ্র এই কবিতাটা পড়েছে? পড়ো, পড়ে দেখো --- বলে এগিয়ে দিলেন একটি পত্রিকা। আমি পড়ে যাই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই নতুন কবিতা

এ- দুয়োরে যায় দূর - দূর !
ও- দুয়োরে যায় ছেই - ছেই!
সুয়োরানী লো সুয়োরানী তোর
রাজ্যে দিল হানা
পাথরচাপা কপাল যার সেই
ঘুঁটেকুড়ুনির ছানা

ঘেন্নায় মরি, ছি!

মন্ত্রী বলল, দেখছি
কোটাল বলল, দেখছি

ঢোল ডগরে পড়ে কাঠি
রক্তে হয় রাঙা মাটি

কাড়ে না কেউ রা
ভালোমানুষের ছাঁ

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে
পাল বোন রইল কাছে

দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার
কালের ডুলি
এই গল্পে ভর্তি করে
ঠাকুরমার ঝুলি।।

কবিতার নাম ঠাকুমার ঝুলি। পড়া শেষ হলে তিনি বলেন সুভাষকে বোলো আমার কথা তার সোনার দোয়াত কলম হোক। এসব কথা এমন করে সুভাষ ছাড়া আর কে বলবে। ইতিহাসে তো কোথাও এদের দুঃখের কথালেখা থাকবে না। প্রবোধচন্দ্রের এইরকম মনে হচ্ছিল। কিন্তু কলকাতায় তাঁর পুরোনো পাঠকেরা, তাঁর পদাতিক - কালীন মুগ্ধ পাঠকেরা, ছি-ছি ধ্বনিতে ভরে উঠেছেন তখন। কেননা, এ তো সরাসরি বামফ্রন্টকে আক্রমণ করে লেখা কবিতা!এ তো বিশুদ্ধ ষড়যন্ত্র! রাগী গলার প্রশ্ন শুনছি কাছে-দূরে এসব কী লিখছে সুভাষ মুখুজ্যে? ভেবেছে কী লোকটা?

কবিতাটি পড়ে আজ এর পিছনকার দুঃসহ ছবিটা সবাই ধরতে পারবেন কি না জানি না। দেশ ভাগ হবারপর ছিন্নমূলের স্রোতে যখন ভাসছিল এই বাংলা, পথে পথে পা রাখবার আর জায়গা নেই যখন, ট্রামেবাসে যখন শুনতে হচ্ছে এই রিফিউজিগুলো এসে দেশটাকে ধ্বংস করে দিল, নতুন বসতির খোঁজে তখন তাদের বড়ো একটা অংশকে পাঠানো হচ্ছিল দণ্ডকবনের দিকে। নামটা ভালো নয়, পরিত্যাগের আর বনবাসের জড়ানো, আর তাছাড়া কেনই- বা বাংলা ছেড়ে বাঙালি যাবে বসবাসের অযোগ্য অজানা ওই দূরের দেশে? দেশও কি বলা যায় তাকে? পড়ে থাকা আফলা জমি শুধু। সেদিনকার বামপন্থী নেতাদের ডাকে আন্দোলনে ভরে উঠল শহর, চাই প্রতিরোধ, খতেই হবে এই অন্যায় নিষ্মণ। রোখা অবশ্য যায়নি শেষ পর্যন্ত।

আজ যখন সেই বামপন্থীরাই আছেন শাসকের আসনে, আজ তাহলে বোধহয় ফিরে পাওয়া যাবে আপন দেশ। ফ্রন্টেরই অন্যতম শরিকদলের প্রেরণায় দণ্ডকপ্রবাসীরা হাজার হাজার এবার ফিরে আসছেন সেই আপনদেশের খোঁজে, সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি অঞ্চলে বসত হচ্ছে তাদের। কিন্তু কী করে তা হবে? এ তো চত্রান্ত। --- মনে হল অনেকের । নতুন গড়ে ওঠা সরকারকে বিপন্নকরবার মতলব ছাড়া কিছুই আর নেই এর মধ্যে। নতুন সরকার এতএত মানুষের দায় নেবে কেমন করে এই মুহূর্তে ? মন্ত্রী বলল, দেখছি. কোটাল বলল, দেখছি। বলপ্রয়োগে উৎখাত হল নতুন সব ছাউনি। ধ্বংসে রক্তে ভরে গেল অঞ্চল। পুড়ল- মরল অনেক। আরও যারা আসছিল, শক্তিমত্ততায় তাদের আটকানো হল কলকাতার দিকে পৌঁছে াবার আগেই, যেমন ধরা যাক বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্মে।

এ নিয়ে যদি কষ্টের বোধ হয় কারো, এদের সঙ্গে যদি একাত্মতা বোধ করে কেউ, তবে সে যে চত্রান্তকারীতাতে আর সন্দেহ কী! আর তেমন - কোনো চত্রান্তকারী হয়ে যাবার ভয়ে কাড়ে না কেউ রা / ভালোমানুষের ছাঁ। খুব সহজেই তখন দণ্ডকে যায় ধর্মরাজার কলের ডুলি ! আর এই নিয়ে আমাদের নতুন ঠাকুরমার ঝুলি, এই আমাদের নতুন দিনের রূপকথা।

কবিতাটি পড়ে সুরজিৎ বসুর মতো কেউ - বা লিখেছিলেন (২৯/০৮/৭৮) যদি ভেবে থাকেন ঠাকুরমার ঝুলি লিখে আমাদের লজ্জা দেবেন তাহলে ভুল করেছেন। তার কারণ নিশ্চয় এই যে এতে কারো কিছু যায় - আসেনা, আর সেইজন্যেই কাড়ে না কেউ রা। তবে এছাড়াও, আরও এক সমস্যা হল অনেকেই দণ্ডক, কলের ডুলি এসব বোঝেনি। চেনা কবি গল্পকার অধ্যাপকদের পড়ানোর ফলাফল শুনলে আপনি কবিতা লেখা ছেড়ে দেবেন, তাই বলছি না।

সুরজিতের এই কথাটা কি সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে রেখেছিলেন, অনেকদিন পরে যখন আত্মধিক্কারে তিনি লিখছিলেন পেরেছিস কি তুলতে জলে / একটুখানি স্রোতও ? / একটুও চিড় ধরেছে শৃঙ্খলে ?
না, হয়তো তা ধরেনি। কিন্তু তবুও, রসেবশে অজাতশত্রু বোবা হয়েও থাকতে চাননি তিনি, দরকার মতো তাঁকে করতেই হয়েছে সমালোচনা, তুলতেই হয়েছে রাজনীতির কথা, বলতেই হয়েছে ক্ষমতার বিদ্ধে, গদি আর গদিয়ানদের বিদ্ধে, আর সেইজন্যে শুনতেও হয়েচে অবিরাম ভেবেছে কী ! এসব কী লিখছে সুভাষ মুখেুজ্যে !
কী যে লিখছিলেন, তা কিন্তু ঠিকমতো পড়েওনি অনেকে। আর পড়লেও, দেয়ালের লিখন এই যে কান - কাটাদের রাজ্যে। / ঠোঁট-কাটারা যাই বলুক না / আনে না কেউ গ্রাহ্যে।।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com